স্বামী বিবেকানন্দের ব্যবহারিক বেদান্ত এবং তাঁর জীবনকালে তার ব্যবহারিক রূপ

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

বাস্তবে রূপায়িত বেদান্ত

বেদান্তে আছে 'জীবঃ ব্রহ্মৈব ন পরঃ'–জীবই ব্রহ্ম। জীব এবং ব্রহ্ম–দুই–ই এক। অর্থাৎ মানুষের মধ্যেই ব্রহ্ম বিরাজ করছেন। বেদান্তের এই বাণী আমরা আবার শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে নতুনভাবে শুনলাম। একদিন দক্ষিণেশ্বরে বৈষ্ণবের অন্যতম কর্তব্য–'জীবে দয়া' প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্তির সঙ্গে বললেন : ব্রহ্মের পাশে মানুষ কীটানুকীট। মানুষ জীবে দয়া করবে–এ কি করে হয়? জীবের মধ্যে যে ব্রহ্ম রয়েছেন, তাঁকে দয়া করবে কে? তা হতে পারে না–জীবে দয়া নয়, জীবসেবা–শিবজ্ঞানে জীবসেবা। শ্রীরামকৃষ্ণ বোঝালেন, স্বয়ং ঈশ্বরের সেবা করছি, এই বোধ নিয়ে, শ্রদ্ধার সাথে, বিনয়ের সাথে, প্রীতির সাথে মানুষের সেবা করতে হবে–দয়া নয়। 'দয়া'র মধ্যে একটা ছোট–বড় ভাব থাকে, বড় ছোটকে অনুকম্পা করছে, এর মধ্যে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব, একটা উপেক্ষার ভাব, একটা আত্মম্ভরিতার ভাবও থেকে যায়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন : জীবে দয়া নয়, সেবা। শুধু সেবা নয়, শিবজ্ঞানে সেবা। এই আলোচনার সময় স্বামী বিবেকানন্দ–তখন তিনি অবশ্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত–উপস্থিত ছিলেন। তিনি মনে মনে সেদিন একটি সঙ্কল্প নিলেন : আজকে একটা অভিনব কথা শুনলাম। যদি ভবিষ্যতে সুযোগ পাই, তাহলে আমি এই মহান সত্যটিকে সর্বত্র প্রচার করব। বনের বেদান্তকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেব। কোন্ মহান সত্য? বেদান্তের কোন্ তত্ত্ব? তা হল–শ্রীরামকৃষ্ণ যার কথা বললেন–"জীবে দয়া নয়–শিবজ্ঞানে জীবসেবা।"

বেদান্তে আমরা নির্বিকল্প সমাধির কথা পাই, যে অবস্থায় মানুষের উপলব্ধি হয় "অহং ব্রহ্মাস্মি"–আমি ব্রহ্ম। অন্যের সম্পর্কে উপলব্ধি হয়–"তত্ত্বমসি"–তুমি ব্রহ্ম। এই অবস্থাপ্রাপ্তিকে আমাদের শ্রুতি বলছেন–মানবজীবনের চরম সার্থকতা যা মানুষকে দেয় পরম পুরুষার্থ বা মুক্তি। এই অবস্থায় যে আনন্দের আস্বাদ মানুষ পায় তা ভাষায় অবর্ণনীয়। জগতের সব আনন্দ সেই আনন্দের কাছে তুচ্ছ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সে–সম্পর্কে বলেছেন : "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।" (৬।২২)–যা লাভ করলে তার চেয়ে অধিক কিছু পাওয়ার আছে বলে মনে হয় না। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তা লাভ করেছিলেন। বুদ্ধদেবও তা লাভ করেছিলেন। কিন্তু ঐ আনন্দকে অন্যের প্রতি ভালবাসায় ভাগ করে নিয়েছিলেন। জগৎকল্যাণের জন্য প্রতিটি নিঃশ্বাস নিয়েছিলেন। এটিই বেদান্তের মর্মবাণী। কিন্তু আমরা তাকে গ্রন্থের মধ্যে, আত্মমগ্ন সাধকের কুঠিয়ার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে দেখেছি। জীবনের সঙ্গে তার যোগ হয়নি। স্বামী বিবেকানন্দ–তখন তিনি যুবক নরেন্দ্রনাথ–শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ভারতের চিরাচরিত সাধককুলের মতো সেই নির্বিকল্প সমাধিতে যাতে তিনি সর্বক্ষণ মগ্ন হয়ে থাকতে পারেন তার জন্যে প্রার্থনা করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সেকথা শুনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। কঠোরভাবে তিরস্কার করে তিনি শিষ্যকে বলেছিলেন : "ছি ছি, তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এই কথা আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস এ তো অতি তুচ্ছ, হীন কথা। নারে, এত ছোট নজর করিস না।" বলেছিলেন : "ও অবস্থার (নির্বিকল্প সমাধির) উঁচু অবস্থা আছে। তুই তো গান গাস–'যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়'।" এই অবস্থাকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন : "জ্ঞানের পর বিজ্ঞান।" নরেন্দ্রনাথ যে নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে থাকার তথা আত্মমুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন, সেই ব্যাকুলতা ভারতবর্ষের প্রাচীন আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে অত্যন্ত বাঞ্ছিত বস্তু। সমাজ–সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাহাড়ের গুহায় অথবা অরণ্যের নিভৃতে নিজের মুক্তির জন্য ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হওয়া ও তাঁর উপলব্ধি ভারতের সাধককুলের অধ্যাত্মজীবনের চিরন্তন অভীপ্সা। কৃষ্ণ ও বুদ্ধ তা থেকে নিজেদের বের করে জগৎকল্যাণে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তা–ই বললেন : "চোখ বুজলে ঈশ্বর আছেন, আর চোখ খুললে কি ঈশ্বর নাই? চোখ খুলেও দেখছি ঈশ্বর সর্বভূতে রয়েছেন।" যুগাবতারের মুখে নরেন্দ্রনাথ সেই পুরাতন বাণী নতুনভাবে শুনলেন। স্পষ্টভাবে জানলেন : শুধু নিজমুক্তির জন্য লালায়িত হওয়া চূড়ান্ত স্বার্থপরতা। জীবনের সার্থকতা জগৎকল্যাণে নিজেকে নিঃস্বার্থভাবে নিঃশেষে নিবেদনে। সেই শোনার, সেই জানার ফলশ্রুতি 'রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ'–'রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন'। হিন্দুধর্মের ইতিহাসে অভিনব এক ধর্মসঙ্ঘ। বৌদ্ধধর্মসঙ্ঘের সঙ্গে তার পার্থক্য "শিবজ্ঞানে"–র অস্তিত্বের জন্য।

স্বামীজী যে নতুন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ গড়লেন তাতে বললেন যে এই সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্য হবে–'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।' এই সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা নিজেদের মুক্তির জন্যে যেমন চেষ্টা করবেন তেমনই জগতের কল্যাণের জন্যেও চেষ্টা করবেন। কিন্তু কি ভাব নিয়ে জগতের কল্যাণের চেষ্টা করবেন? ঐ শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"র ভাব নিয়ে। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন–"অচল বিগ্রহ আর সচল বিগ্রহ।" আমরা মন্দিরে

যাই, তীর্থস্থানে যাই। সেখানে যে বিগ্রহ আছেন তাঁর পুজো করি। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে বলতেন, অচল বিগ্রহ। অচল অর্থাৎ যে বিগ্রহের পূজা করছি সেই বিগ্রহ হয়তো কাঠের তৈরি, মাটির তৈরি, পাথরের তৈরি, না হয় ধাতুর তৈরি। তাঁর সেবা করছি, পূজা করছি, কিন্তু তিনি যে আমার সেবা নিচ্ছেন, পুজো নিচ্ছেন, তিনি যে আমার সেবায় তৃপ্ত হচ্ছেন–আমি তার কোন প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি না তাঁর মুখের মধ্যে। কিন্তু ভক্ত তা দেখতে চায়। অবশ্য যথার্থ যে ভক্ত সে দেখে বা দেখতে পায়। কিন্তু সেটা আলাদা কথা। সাধারণের কাছে সে প্রকাশ স্পষ্ট নয়। তাই স্বামীজী বললেন : ‘‘তার চেয়ে আমাদের সামনে যে অসংখ্য মানুষরূপী সচল বিগ্রহ রয়েছেন–এসো আমরা তাঁর সেবা করি, পূজা করি।’’ শুধু ‘সেবা’ নয়, গুরুর ভাবকে সুপরিস্ফুট করে স্বামীজী বললেন : ‘‘পুজা।’’ স্বামীজী বললেন–এখানে নারায়ণ এসেছেন তোমার সামনে, তোমার কাছে সচল বিগ্রহরূপে। তুমি তাঁর সেবা কর, তুমি তাঁর মুখে স্পষ্ট তৃপ্তির প্রকাশ দেখতে পাবে। তিনি যে খুশি হয়েছেন তোমার সেবায় তা তুমি নিজের চোখে দেখতে পাবে। এই সচল বিগ্রহ বিভিন্ন রূপে তোমার সামনে রয়েছে। হয়তো মূর্খরূপে, দুষ্টরূপে, আর্তরূপে, দরিদ্ররূপে, বুভুক্ষুরূপে, পাপীরূপে। তাদের সকলকেই নারায়ণজ্ঞানে শ্রদ্ধার সঙ্গে, প্রীতির সঙ্গে সেবা কর। করে ধন্য হও। তিনি বলেছেন : ‘‘বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? / জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।’’

একটা অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে গেলেন স্বামীজী। তিনি বলেছেন : এটাই ‘প্রাকটিক্যাল বেদান্ত’, বাস্তবে রূপায়িত বেদান্ত। বেদান্ত শুধু একটা আদর্শ নয়, তত্ত্ব নয়, তাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে এবং বাস্তবে যদি রূপ দিতে হয় তবে তা এইভাবে রূপ দিতে হবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার হবে এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে। অর্থাৎ ঈশ্বরবুদ্ধিতে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভগবান আছেন, সেই ভগবানের সঙ্গে আমি মিশছি, ব্যবহার করছি, কথা বলছি–তা স্মরণ রেখে আমরা যেন চলি। অনেকের ধারণা যে, রামকৃষ্ণ মিশন সমাজসেবা করে। কিন্তু এটা ভুল ধারণা। সমাজসেবা বলতে যা বোঝায়, রামকৃষ্ণ মিশন সেই অর্থে সমাজসেবা করে না। এই সেবাকাজ–যা এযুগে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু–সন্ন্যাসীরা করছেন–স্কুল–কলেজ চালাচ্ছেন, হাসপাতাল চালাচ্ছেন, লাইব্রেরি চালাচ্ছেন, অনাথ আশ্রম চালাচ্ছেন, খরা–দুর্ভিক্ষ–বন্যায় ত্রাণকার্য পরিচালনা ইত্যাদি যা কিছু জনকল্যাণমূলক কাজ করছেন, তা তাঁদের যে আধ্যাত্মিক জীবন–তারই অঙ্গ। এ সেবা সেবা নয়, সেবাযজ্ঞ–পূজা, উপাসনা।

সাধারণ দৃষ্টিতে এসব ‘কর্ম’, কিন্তু ‘ব্যবহারিক বেদান্ত’–এর মতে এসব কর্ম নয়–কর্মযোগ। কর্ম এখানে ধর্ম। সূচনাপর্বে এবং তার পরেও বহুকাল সনাতনপন্থী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়গুলির কাছে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাসী বলেই গণ্য হতেন না। তাঁরা ছিলেন অচ্ছুৎ অপাংক্তেয়–‘ভাঙ্গী সাধু’। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরুর প্রেরণায় ও তাঁর আর্ষদৃষ্টিতে দেখেছিলেন ভারতবর্ষের সন্ন্যাস–আদর্শের ভাবী রূপ ও গতিকে–যা হবে যুগোপযোগী, যা হবে ভারতবর্ষের অধ্যাত্মক্ষেত্রে এক নতুন আলোকস্তম্ভ। ভারতের সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছরের যে ইতিহাসের সঙ্গে আমরা পরিচিত তাতে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ ছাড়া আর কোন ধর্মসঙ্ঘের নাম আমরা জানি না যেখানে কর্ম ও উপাসনা, জীবসেবা ও ঈশ্বরপূজার মধ্যে অভিন্নতার আদর্শ কর্মে পরিণত রূপ পেয়েছে। আত্মমুক্তি এবং জগৎকল্যাণ উভয় আদর্শকে সমন্বিত করে স্বামী বিবেকানন্দের এই সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠা পৃথিবীতে এক অভিনব কীর্তি। অবশ্য এই সঙ্ঘের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা স্বামী বিবেকানন্দ করলেও এর ভাবস্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং।

বেদান্তের ব্যবহারিক রূপ

আমরা এতক্ষণ যে–আলোচনা করে এলাম তা হল রামকৃষ্ণ–বিবেকানন্দ নতুন ধর্মাদর্শের মূলতত্ত্ব যা স্বামীজী–প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভিত্তি–দর্শন হিসাবে গৃহীত। প্রসঙ্গত, একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, ‘স্বামীজী–প্রতিষ্ঠিত’ বলতে আমরা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ‘আনুষ্ঠানিক’ প্রতিষ্ঠার কথাই বোঝাতে চেয়েছি ভাবগত অর্থে এবং অধ্যাত্মপ্রেরণার দিক থেকে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা যে শ্রীরামকৃষ্ণ সেকথা আগেই বলেছি।

আমরা এখন আলোচনা করতে চাই, স্বামীজী স্থূলদেহে বর্তমান থাকাকালীন তাঁর ভাব ও তত্ত্বের কতখানি বাস্তব রূপায়ণ তিনি দেখে গিয়েছিলেন সেই কাহিনীর কিয়দংশ। সেই কাহিনী হল একদিকে ‘‘শিবজ্ঞানে জীবসেব’’ এবং অন্যদিকে ‘‘আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ’’–এই দুই আর্ষবাক্যকে হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ করে বাস্তবে রূপদান করাটাই হচ্ছে স্বামীজীর গুরুভাই ও শিষ্যগণের আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত ইতিবৃত্ত।

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে স্বামীজী পাশ্চাত্য থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন। বিশ্বজয়ী সন্তানের গর্বে সারা কলকাতা তখন মাতোয়ারা। মার্চ মাসের মাঝামাঝি চিকিৎসকের পরামর্শে স্বাস্থ্যোদ্ধার ও বিশ্রামের জন্য ভগ্নস্বাস্থ্য স্বামীজী দার্জিলিঙে গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে স্বামীজীর সেবাদর্শে অনুপ্রাণিত এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ‘জীব–শিব’ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ স্বামীজীর গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদের মহুলা অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ–পীড়িত মানুষদের সেবায় প্রাণপাত শুরু করেছেন ঐ সময় (মার্চ–এপ্রিল, ১৮৯৭)। স্বামীজী দার্জিলিঙ থেকে ফিরে গুরুভায়ের সেবাব্রতের সংবাদ পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখলেন : ‘‘সাবাস বাহাদুর ওয়া গুরুজী কী ফতে কাজ করে যাও, যত টাকা লাগে আমি দেব।’’ তাঁর নিজস্ব তহবিল থেকে স্বামীজী কিছু টাকাসহ স্বামী সুরেশ্বরানন্দ এবং স্বামী নিত্যানন্দকে অখণ্ডানন্দজীর

সাহায্যকারী হিসাবে পাঠালেন। সুরেশ্বরানন্দ তখন অবশ্য সন্ন্যাস পাননি, তখন তিনি ব্রহ্মচারী সুরেন্দ্র। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সেই হল সেবাধর্মের সূচনা। স্বামী অখণ্ডানন্দ অবশ্য এর আগে ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজীর প্রেরণায় রাজপুতানায় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কিছুদিন উদয়পুর ও খেতড়ি অঞ্চলে সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ঐ সময় শিকাগো থেকে (মার্চ/এপ্রিল, ১৮৯৪) স্বামীজী উদ্দীপনাময় ভাষায় তাঁকে লিখেছিলেন : "কার্য করিতে হইবে।... খেতড়ি শহরে গরিব, নীচ জাতিদের ঘরে ঘরে গিয়া ধর্ম উপদেশ করিবে আর তাহাদের অন্যান্য বিষয়, ভূগোল ইত্যাদি মৌখিক উপদেশ করিবে।... মধ্যে মধ্যে অন্য অন্য গ্রামে যাও, উপদেশ কর, বিদ্যাশিক্ষা দাও। কর্মই উপাসনা ও জ্ঞান। কর্ম কর, তবে চিত্তশুদ্ধি হইবে, নতুবা সব ভস্মে ঘি ঢ়ালার ন্যায় নিষ্ফল হইবে।... পরোপকারার্থে ঘাস খাইয়া জীবনধারণ করা ভাল। গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্য নহে, মহাকার্যের নিশান-কায়মনোবাক্যে 'জগদ্ধিতায়' দিতে হইবে। পড়েছ 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব', আমি বলি, 'দরিদ্রদেবো ভাব, মূর্খদেবো ভব'। দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম জানিবে।"

যাই হোক, মুর্শিদাবাদের মহুলায় রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম আনুষ্ঠানিক সেবাকার্য শুরু হল। স্বামীজীর উৎসাহ ও প্রেরণায় স্বামী অখণ্ডানন্দ স্থির করলেন : "মন্ত্রং বা সাধয়েয়ম্, শরীরং বা পাতয়েয়ম্।" "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।" স্বামীজীর অর্থসাহায্যে সহকারীদের নিয়ে প্রণালীবদ্ধভাবে অখণ্ডানন্দজীর দুর্ভিক্ষ ত্রাণ শুরু হল ১৫ মে ১৮৯৭। গ্রামে গ্রামে ঘুরে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট মানুষদের চিহ্নিত করে (survey) ত্রাণ-সাহায্যের জন্য 'টিকিট' দিয়ে আসতেন তাঁরা এবং চাল, বস্ত্র ইত্যাদি নিজেরা বিতরণ করতেন। ইতিমধ্যে (১লা মে) 'রামকৃষ্ণ মিশন' স্থাপিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশনের 'দুর্ভিক্ষ তহবিল'ও গঠিত হয়েছে। স্বামী অখণ্ডানন্দের নেতৃত্বে এই সেবাব্রতের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম প্রণালীবদ্ধ সেবাকর্ম যেমন আরম্ভ হল তেমনি ভারতের ধর্ম-ইতিহাসেও সূচনা হল এক নতুন যুগের, এক নতুন ঐতিহ্যের। উল্লসিত স্বামীজী গুরুভাইকে লিখলেন (১৫ জুন ১৮৯৭) : "তোমার সবিশেষ সংবাদ পাইতেছি ও উত্তরোত্তর আনন্দিত হইতেছি। ঐরূপ কার্যের দ্বারাই জগৎ কিনিতে পারা যায়।... সাবাস তুমি আমার লক্ষ লক্ষ আলিঙ্গন, আশীর্বাদাদি জানিবে। কর্ম, কর্ম, কর্ম হাম আউর কুছ নেহি মাঙ্গতে হেঁ—কর্ম, কর্ম, কর্ম even unto death (আমরণ)।... ক্ষুধিতের পেটে অন্ন পৌঁছাতে যদি নাম ধাম রসাতলেও যায়, অহোভাগ্যম্ অহোভাগ্যম্...It is the heart, the heart that conquers, not the brain (হৃদয়—শুধু হৃদয়ই জয়ী হয়ে থাকে-মস্তিষ্ক নয়)। পুঁথি-পাতড়া, বিদ্যে-সিদ্যে, যোগ-ধ্যান-জ্ঞান-প্রেম কাছে সব ধূলসমান-প্রেমেই অণিমাদি সিদ্ধি, প্রেমেই ভক্তি, প্রেমেই জ্ঞান, প্রেমেই মুক্তি। এই তো পুজো, নরনারী-শরীরধারী প্রভুর পুজো, আর যা কিছু 'নেদং যদিদম্ উপাসতে'। এই তো সবে আরম্ভ, এরূপে আমরা ভারতবর্ষ-পৃথিবী ছেয়ে ফেলব না?"

স্বামীজীর অগ্নিময় প্রেরণায়, স্বামী ব্রহ্মানন্দের সক্রিয় সহযোগিতায়, গুরুভাইদের সহৃদয় সহায়তায় স্বামী অখণ্ডানন্দ নবযুগের নবযুগধর্মকে মহা-উদ্যমে প্রচার ও প্রায়োগিক রূপ দিয়ে চললেন।

মহুলায় দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্য পরিচালনার সময় অনাথ বালক-বালিকাদের দুঃখকষ্ট দেখে স্বামী অখণ্ডানন্দ একটি অনাথ-আশ্রম খোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীকে চিঠি লিখে তাঁর মতামত চাইলেন তিনি। ২৪ জুলাই ১৮৯৭ স্বামীজী অখণ্ডানন্দজীকে উত্তর দিলেন : 'Orphanage (অনাথ-আশ্রম) সম্বন্ধে তোমার অভিপ্রায় অতি উত্তম।... একটা স্থায়ী Centre (কেন্দ্র) যাহাতে হয় তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।... টাকার চিন্তা নাই।..." ৩১ আগস্ট ১৮৯৭ মহুলায় একটি অনাথ-আশ্রম শুরু হল। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের শেষে অনাথ বালকদের সংখ্যা দাঁড়াল বারো। ক্রমে সেই সংখ্যা বেড়েই চলল। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে অনাথ শিশুদের অখণ্ডানন্দজী পরম স্নেহে তাদের গায়ে তেল মাখিয়ে স্নান করাতেন আর স্বামীজীর কথা স্মরণ করতেন : "ইহারাই তোমার দেবতা" এবং গভীর আবেগের সঙ্গে ভগবান নারায়ণের স্নানমন্ত্র বেদোক্ত 'পুরুষসূক্ত' আবৃত্তি করতেন :

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ..."

অনাথ-আশ্রম চালানোর জন্য তিনি তাঁর পরিচিত কয়েকজন ধনী ব্যক্তির কাছে ঐ সময় অর্থসাহায্যের আবেদন করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কাশীর প্রমদাদাস মিত্র। তিনি অর্থসাহায্য তো দূরে থাক, অখণ্ডানন্দজীকে উল্টে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, সাধু-সন্ন্যাসীদের কাজ প্রব্রজ্যা, তপস্যা এবং স্বাধ্যায়। দুর্ভিক্ষ-ত্রাণ বা অনাথ-আশ্রম চালানো সাধু-সন্ন্যাসীর কর্ম নয়। উত্তরে স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রমদাদাস মিত্রকে যে-দুটি চিঠি দিয়েছিলেন তাতে জ্বলন্ত ভাষায় স্বামীজীর নবীন আদর্শকে তিনি তুলে ধরেছিলেন রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের মুখপাত্র প্রমদাদাস মিত্রের কাছে। প্রথম চিঠিতে (১০ অক্টোবর ১৮৯৮) তিনি লিখেছেলেন : "...সে একদিন গিয়াছে-আর এ একদিন... তখন আমি হিমালয়ে গিয়া পর্যন্ত মানুষ দেখিয়া বেজার হইয়াছিলাম, এবং পাহাড়ী গ্রাম ছাড়িয়া অতিশয় বিজন ও হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ পর্বতশিখরে গিয়া মনুষ্যসমাজ পরিত্যাগ করিয়া বাস করিতে ভালবাসিতাম। এইরূপে ক্রমান্বয়ে কয়েক বৎসর নিভৃত বাস করিয়াও দেখিয়াছি। কিন্তু এখন দেখিতেছি, মানুষকে পরিত্যাগ করিয়া **যে-আমি**

একদিন হিমালয়ের উচ্চ উচ্চ পর্বতশ্রেণীর মস্তকে মস্তকে বেড়াইতাম, সেই আমি মনুষ্যেই সাক্ষাৎ ভগবানকে দেখিতেছি এবং বুঝিতেছি মনুষ্য-সমাজের সেবাই তাঁহার সেবা। ভগবান যেন আসিয়া আমার কানে কানে বলিতেছেন-ওরে, এই মানুষই বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, রাম-কৃষ্ণাদি অবতার-এই মানুষই সব।" (স্থূলাক্ষর বর্তমান প্রবন্ধকারের।)

দ্বিতীয় চিঠিতেও (১০ জানুয়ারি ১৮৯৯) অখণ্ডানন্দজী পুনরায় পরম আবেগ ও গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে তাঁর অন্তরের উপলব্ধিকে বাঙ্ময় করলেন : "আমার প্রভু আমার হৃদয়েই আছেন এবং সদাকালই থাকিবেন। আমার প্রভু গিরিশৃঙ্গে বা নীলাকাশে বসিয়া নাই, আমার প্রভু আমার আত্মা-সর্বজীবে। সেই সর্বজীবরূপী ভগবানকে অমি মুহুর্মুহুঃ বলিতে শুনিতেছি যে, 'ওরে মানুষই বৈদিক ঋষিছন্দ, মানুষের মধ্যেই রামকৃষ্ণাদি অবতার, সেই মানুষের কি শোচনীয় অবস্থা দেখছিস নি?' একথা যে শোনে তার কি স্থির থাকবার জো আছে? এই মানুষের সেবায় এ-জীবন দিয়াছি আরও কত জীবন যে দিতে হইবে বলিতে পারি না।"

পরবর্তী কালে মহুলার অনাথাশ্রম স্থান পরিবর্তন করতে করতে অবশেষে ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে মহুলা থেকে সামান্য দূরে সারগাছিতে বর্তমান নিজস্ব জমিতে উঠে আসে এবং অখণ্ডানন্দজীর নেতৃত্বে স্বামীজীর সেবাব্রত অধিকতর গতিলাভ করে। সে-আলোচনা আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গের পরিধির বাইরে। তাই তাতে আমরা যাচ্ছি না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইতিপূর্বে স্বামীজীর জীবনকালে অনাথাশ্রমের কাজ চালাতে চালাতেই অখণ্ডানন্দজী ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ভাগলপুর জেলায় বিধ্বংসী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে সেবাকার্য পরিচালনা করেন এবং পঞ্চাশটি গ্রামের দুর্গত মানুষকে আহার, পরিধেয় এবং চিকিৎসার (বন্যার্তরা কলেরায় আক্রান্ত হয়েছিলেন) মাধ্যমে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্বামীজীর শিষ্য স্বামী সদানন্দ। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে কাশিমবাজার অঞ্চলে কলেরায় আক্রান্ত একটি গ্রামে নিজের জীবন বিপন্ন করে একাকী ত্রাণ-কার্যে নামেন তিনি। তাঁর সময়োচিত সেবাব্রতে গ্রামটি মহামারীতে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

কাছাকাছি সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনায় এবং স্বামীজীর নির্দেশ ও প্রেরণায় নানা স্থানে আরো কয়েকটি সেবাত্রাণের কাজ সংগঠিত হয়েছিল। সেগুলিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কোথাও স্বামীজীর গুরুভাইগণ, কোথাও বা তাঁর শিষ্যগণ। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলায় দুর্ভিক্ষ তার করাল ছায়া বিস্তার করেছে সংবাদ পেয়ে সঙ্ঘের নির্দেশে সেবাব্রত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। ঐ অঞ্চলে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে চুরাশিটি গ্রামের বহু দুর্গত মানুষকে অনাহার ও মৃত্যু থেকে রক্ষা করেন তিনি। এই বিরাট সেবাকর্মে সরকার বা অন্য কারও সাহায্যের অপেক্ষা তিনি করেননি-এ-কথা সরকারের প্রতিনিধি দিনাজপুরের তৎকালীন জেলাশাসক মিঃ এন. বনহাম কার্টার তাঁর সরকারী রিপোর্টে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের এই সেবাব্রত বিদেশী শাসককুলের প্রভূত প্রশংসা অর্জন করলেও এ দেশের গোঁড়ারা ভাল চোখে দেখেননি। সেবাব্রতী স্বামী অখণ্ডানন্দকে গোঁড়াদের প্রতিনিধি কাশীর প্রমদাদাস মিত্র ভর্ৎসনা করেছিলেন, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। মিত্রমশায় স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে নিষ্কৃতি দেননি। দুর্ভিক্ষ-সেবাব্রতী স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে সম্ভবত প্রমদাদাস কিছু জ্ঞান বিতরণ করেছিলেন এই মর্মে যে, সন্ন্যাসীর মঠ-মন্দির, পুজো-পাঠ নিয়েই থাকা উচিত এবং মনুষ্য-সংশ্রবহীন পর্বতগুহায় অথবা অরণ্যে পর্ণকুটিরে ধ্যান-ভজনে কালাতিপাত করাই সন্ন্যাসীর একমাত্র কৃত্য। প্রমদাদাসবাবুকে ত্রিগুণাতীতানন্দজী তার উত্তরে যা লিখেছিলেন (২৪ জানুয়ারি ১৮৯৮) তাতে আমরা এক মহা-উপাসকের হৃদয়ের স্পন্দনধ্বনি শুনি যিনি প্রতিটি মানুষের মধ্যে সচল ঈশ্বরকে সদা-সর্বদা দেখেন : "দুর্ভিক্ষ-পীড়িতগণ অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে শুনিয়া এবং গৃহস্থ মহাশয়গণ (যে গৃহস্থগণের একজন উদ্যমী প্রতিভূ প্রমদাদাস মিত্রও) নিজ নিজ কর্তব্যকর্ম—মৃতপ্রায় ব্যক্তিদিগকে অন্নদান করিতেছেন না দেখিয়াই **ধ্যানধারণাদি কার্য কিয়ৎকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া উক্ত কার্যে গিয়াছিলাম।** (স্থূলাক্ষর প্রবন্ধ লেখকের) যাঁহারা ঈশ্বরকে ডাকেন তাঁহারা দয়াশীল হন। যিনি ঈশ্বরের উপাসনা করেন এবং একটি লোক অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিতেছে দেখিয়াও যদি নিশ্চিতভাবে নিজের উদরপূর্ণ করিতে রত থাকেন, তিনি যে কিপ্রকার ব্যক্তি তাহা বলিতে পারি না..." প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা স্বামী অখণ্ডানন্দ এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের লেখনী-নিঃসৃত প্রতিটি শব্দের পিছনে যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ উপলব্ধির আগ্নেয়প্রেরণাই ক্রিয়াশীল ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রায় একই সময়ে (অক্টোবর ১৮৯৭) স্বামীজীর সন্ন্যাসী-শিষ্য স্বামী বিরজানন্দ দেওঘরে একটি দুর্ভিক্ষ-সেবাকেন্দ্র পরিচালনা করেন। কাছাকাছি সময়ে (১২ অক্টোবর ১৮৯৭-৯ জানুয়ারি ১৮৯৮) দক্ষিণেশ্বরে বন্যার্তদের সেবাব্রত পরিচালনা করেছিলেন স্বামীজীর-শিষ্য স্বামী প্রকাশানন্দ। কলকাতাতেও ঐকালে অনুরূপ সেবাকার্য সংগঠিত হয়েছিল মিশনের তত্ত্বাবধানে। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে দার্জিলিঙে যে ভয়াবহ ধ্বস নামে তাতে সেখানকার মানুষ অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টে পতিত হয়। সেখানে আর্ত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান স্বামীজীর এক গুরুভাই-স্বামী শিবানন্দ। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে রাজপুতানার কিষেণগড়ে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা যায়। স্বামীজীর দুই শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দ এবং স্বামী

স্বরূপানন্দ তখন পরিব্রাজক হয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরছেন। কিষেণগড়ের দুর্ভিক্ষের সংবাদ শোনামাত্র তাঁরা তপস্যা ও তীর্থভ্রমণ পরিত্যাগ করে নেমে পড়লেন আর্ত ও বুভুক্ষু নারায়ণের সেবায়। অল্পদিনের মধ্যে মঠ-কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন স্বামীজীর আরো দুই শিষ্য-স্বামী আত্মানন্দ এবং স্বামী নির্মলানন্দ। কিষেণগড়ে একটি অস্থায়ী অনাথাশ্রমও স্থাপন করা হয়েছিল। সেখানে স্থান পেয়েছিল বেশ কিছু অনাথ বালক-বালিকা। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডোয়াতে দুর্ভিক্ষ সেবায় নেমেছিলেন পূর্বে উল্লিখিত স্বামী সুরেশ্বরানন্দ। চার মাস ধরে সেখানে সেবার কাজ তিনি চালান এবং প্রায় চৌদ্দ হাজার মানুষের জীবনরক্ষা করেন।

১৮৯৮ ও ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে দু-দুবার কলকাতায় প্লেগ মহামারীর আকারে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কলকাতার আবালবৃদ্ধবনিতা প্রাণভয়ে দলে দলে শহর ছেড়ে পালাতে শুরু করেছিল। বহু সংখ্যক মানুষ সেই ভয়াবহ প্লেগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন। প্লেগাক্রান্ত কলকাতার মানুষকে বাঁচানোর জন্য স্বামীজী 'শিশু' রামকৃষ্ণ মিশনকে সর্বশক্তিসহ পথে নামিয়েছিলেন। স্বামীজীর গুরুভাইগণ, তাঁর দুই অগ্নি-সন্তান স্বামী সদানন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতা যদি সেসময় স্বামীজীর নেতৃত্বে সেবাকার্যে না ঝাঁপিয়ে পড়তেন তাহলে ভারতের তৎকালীন রাজধানী হয়তো একটি পরিত্যক্ত নগরেই পরিণত হতো। ত্রাণের প্রয়োজনে অর্থের অভাব দেখা দিতে সদ্য-ক্রীত বেলুড় মঠের জমি পর্যন্ত বিক্রি করতে উদ্যত হয়েছিলেন স্বামীজী। প্লেগাক্রান্ত কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশনের সেই সেবার ইতিহাস বিস্তৃত বর্ণনার দাবী রাখে।

এখন আমরা আসছি আমাদের আলোচনার শেষ পর্যায়ে-ভারতের দুই প্রাচীন তীর্থভূমি কনখল এবং বারাণসীতে স্বামীজীর প্রেরণায় সংগঠিত অসাধারণ সেবাব্রতের স্বল্পজ্ঞাত উপাখ্যান প্রসঙ্গে। বাস্তবিকই সে এক 'উপাখ্যান'ই স্বামীজীর প্রত্যক্ষ প্রেরণায় ঐ দুই সনাতন তীর্থ ও তপস্যাভূমি কিভাবে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র আধুনিক যজ্ঞভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছিল সে-কাহিনী যেমন প্রাণস্পর্শী তেমনই মহনীয়।

ইতিপূর্বে রাজপুতানার কিষেণগড়ে দুর্ভিক্ষ-সেবা প্রসঙ্গে স্বামী কল্যাণানন্দের নাম আমরা উল্লেখ করেছি। উল্লেখ করেছি তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত অস্থায়ী অনাথাশ্রমের কথাও। ভিক্ষালব্ধ অর্থ ও দ্রব্যের সাহায্যে তাঁরা বেশ কিছুকাল ধরে প্রতিদিন ৩০০ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তির মুখে অন্ন তুলে দিয়েছিলেন। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত স্বামী কল্যাণানন্দ কিষেণগড়ে সেবাব্রত পরিচালনা করেন। অনাথাশ্রমে তখন ৫০ জন বালক এং ২০ জন বালিকা প্রতিপালিত হচ্ছিল। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে কল্যাণানন্দজী বেলুড় মঠে আসেন দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য প্রত্যাগত স্বামীজীর দর্শন-মানসে। একদিন গুরু তাঁকে বললেন : "দেখ কল্যাণ, হৃষীকেশ-হরিদ্বার অঞ্চলের অসুস্থ রুগ্ন সাধুদের জন্য কিছু করতে পারিস? তাঁদের দেখবার কেউ নেই। তুই গিয়ে তাঁদের সেবায় লেগে যা।" পরিব্রাজক জীবনে স্বামীজী বৃদ্ধ ও অসুস্থ সাধুদের দুঃখ-কষ্ট স্বচক্ষে দেখেছিলেন। নিজেও অসুস্থ হয়ে ঐ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তখন থেকেই অসহায় বৃদ্ধ ও পীড়িত সাধুদের সেবার ব্যাপারটি তাঁর মনে গভীর দাগ কেটে রেখেছিল। সানন্দে গুরুর আদেশ শিরোধার্য করলেন কল্যাণানন্দজী। কালবিলম্ব না করে সেই আদেশ এবার বাস্তবে রূপদানের কাজে নেমে পড়লেন তিনি। মাস দেড়েক নৈনিতাল অঞ্চলে দ্বারে দ্বারে অর্থভিক্ষা করলেন। এই কাজে তাঁর সঙ্গে ছিলেন গুরুভাই স্বামী স্বরূপানন্দ। সেই ভিক্ষালব্ধ অর্থে ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে কনখলে মাসিক তিন টাকায় দু-খানা ঘর ভাড়া নিয়ে কল্যাণানন্দজী সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। ঐ দু-খানা ঘরেই পীড়িত সাধুদের শয্যা, চিকিৎসাগার এবং তাঁর নিজের বাসস্থান। কুঠিয়া বা রাস্তা থেকে বৃদ্ধ ও পীড়িত সাধুদের তিনি সেখানে নিয়ে আসতেন। স্বয়ং তাঁদের জন্য আহার্য ও পথ্য প্রস্তুত করতেন, সেবা-শুশ্রূষা করতেন। নিজের আহার মাধুকরী ভিক্ষার দ্বারা সংগ্রহ করতেন। সাধুদের দেহত্যাগ হলে তিনি একাই গঙ্গাতীরে তাঁদের সৎকারাদি করতেন। শুধু যে সাধুদেরই সেবা সেবাশ্রমে হতো তা নয়, দরিদ্র ও দুঃস্থ মানুষদের সেবাও একইভাবে হতো। ক্রমে কনখল থেকে সেবাশ্রমের সেবার পরিধি পনের মাইল দূরবর্তী হৃষীকেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হল। অল্পদিনের মধ্যে (১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে) কল্যাণানন্দজীর সঙ্গে মিলিত হলেন একই আদর্শে অনুপ্রণিত স্বামীজীর শিষ্য গুরুভাই স্বামী নিশ্চয়ানন্দ। রোগীর মলমূত্র পরিষ্কার, শবদেহ সৎকার প্রভৃতি কর্ম হিন্দু সাধু সন্ন্যাসীদের কখনো করতে দেখেননি ভারতবর্ষের মানুষ। উত্তরাখণ্ডের সাধুরা তাই অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন এই 'হীন' কর্মে নিরত সন্ন্যাসীদ্বয়কে। তাঁরা ওঁদের উপেক্ষা ও ঘৃণার সঙ্গে অভিহিত করতেন 'ভাঙ্গী সাধু' বলে। স্বামীজীর সঙ্গে কল্যাণানন্দজীর আর একবারমাত্রই দেখা হয়েছিল। তাঁর মহাপ্রয়াণের মাত্র কয়েকদিন আগে। ১৯০২-এর জুন মাসে কল্যাণানন্দজী বেলুড় মঠে এসেছিলেন গুরুর সান্নিধ্যলাভের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। কিছুদিন গুরুসঙ্গ করে অধিকতর উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি ফিরে গেলেন কনখলে। কয়েকদিন পর স্বামীজীর দেহান্ত হলো। স্বামীজী সেবার তাঁকে বলেছিলেন : "দেখ কল্যাণ, আমার কেমন ইচ্ছা হয় জানিস? একদিকে ঠাকুরের মন্দির থাকবে-সাধু-ব্রহ্মচারীরা তাতে ধ্যানধারণাদি করবে, তারপর যা ধ্যান করলে practical field-এ (বাস্তবে) তা কাজে লাগাবে।" এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় মধ্যযুগের এক খ্রীস্টান মরমী সাধক মেয়েস্টার একহার্টের একটি অসাধারণ কথা "What you gain in contemplation pour out in love." স্বামীজীও ঠিক

তা-ই বললেন। যাই হোক, কল্যাণ-স্বামীকে কথিত স্বামীজীর পরম যত্নে লালিত ইচ্ছার তাৎপর্য বুঝিয়ে বলতেন স্বামীজীর আরেক শিষ্য স্বামী অচলানন্দ : "আসল ভাব হচ্ছে প্রাকটিক্যাল বেদান্ত। শুধু থিয়োরেটিক্যাল নয়, বেদান্তকে কাজে পরিণত করতে হবে।" কনখল সেবাশ্রমের কর্মকাণ্ডে কল্যাণ-স্বামী এবং নিশ্চয়-স্বামী স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত রূপ দিয়েছিলেন। আজ কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একটি বিরাট সেবাপ্রতিষ্ঠান। সাধু-সন্ন্যাসী, দরিদ্র জনসাধারণের সেবার ক্ষেত্রে সমগ্র উত্তরাখণ্ডে 'সেবাশ্রম' পুরোধার স্থান নিয়েছে কিন্তু এর পটভূমিতে রয়েছে স্বামী কল্যাণানন্দ এবং স্বামী নিশ্চয়ানন্দের নীরব রক্তক্ষয়ী সেবা ও নিঃশেষ আত্মদানের সুদীর্ঘ সাধনা। আজ সমগ্র উত্তরাখণ্ডের সাধুসমাজে কনখল রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা এবং সামগ্রিকভাবে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসীমণ্ডলী বহুমানিত কিন্তু ভুললে চলবে না যে, সেই সমুচ্চ সম্মান অর্জিত হয়েছে ঐ দুই আত্মবিলয়ী সেবাব্রতীর মহনীয় জীবনসাধনার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তেই। যাঁরা একদিন বিদ্রূপ, অসম্মান ও উপেক্ষায় তাঁদের সাধুসমাজে অপাঙ্ক্তেয় করেছিলেন, তাঁরাই পরে নিজেদের ভুল উপলব্ধি করে তাঁদের সাধুসমাজের শিরোভূষণ জ্ঞান করছেন এবং 'ব্যবহারিক বেদান্ত' বা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সেবাদর্শই যে বর্তমানের যুগধর্ম তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করছেন। বস্তুত, এটি একটি নীরব বিপ্লব যা বর্তমান ও ভাবী কালের ভারতীয় অধ্যাত্ম ও ধর্মচিন্তাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করছে এবং করবে।

এবার বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের প্রসঙ্গ।

১৯০০ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসের বারো তারিখ। বারাণসীতে স্বামীজীর প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত চারুচন্দ্র দাস নামে এক যুবকের হাতে আসে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মুখপত্র 'উদ্বোধন'-এর প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যাটি। পত্রিকাটি খুলেই চারুচন্দ্র চমকে উঠলেন, তাতে প্রথমেই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের 'সখার প্রতি' কবিতাটি। অসাধারণ প্রাণস্পর্শী রচনা। কবিতাটির শেষ স্তবকটি বার বার পড়লেন চারুচন্দ্র :

"ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়।
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।।"

চারুচন্দ্রের দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। স্বামীজীর আহ্বানে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। ছুটলেন এক প্রিয় বন্ধুর কাছে : "শোন স্বামীজীর বেদান্তবাণী। ঐ যে সম্মুখে ব্যাধি-পীড়িত বুভুক্ষু দরিদ্রদের দেখছ, ওরাই আমাদের ঈশ্বর-আমাদের নারায়ণ-আমাদের শিব।" তড়িৎপ্রবাহ খেলে গেল বন্ধুর শরীরেও। এক প্রদীপ থেকে আর এক প্রদীপ। আরেক বন্ধু নাম কেদারনাথ মৌলিক, তিনিও জ্বলে উঠলেন চারণ সন্ন্যাসীর অগ্নিময় সেই পংক্তিগুলির প্রেরণায়। চারুচন্দ্র ও তাঁর বন্ধুগণ স্থির করলেন, আর দেরি নয়, ভারতের প্রাচীনতম শিবক্ষেত্রেই তাঁরা স্থাপন করবেন ভারতের নবীনতম যুগাচার্যের নববেদান্তের যজ্ঞভূমি। মানসিক অর্থে তা সেদিনই স্থাপিত হয়ে গেলেও আনুষ্ঠানিক অর্থে তিন মাস পর (১৫ সেপ্টেম্বর ১৯০০ খ্রীস্টাব্দ) তার প্রকাশ্য আত্মপ্রকাশ ঘটল। স্থাপিত হলো 'Poor Men's Relief Association'-'দরিদ্র-দুঃখ-প্রতিকার সমিতি'। দুঃস্থ, অসহায়, পীড়িত, দরিদ্র মানুষদের সেবার জন্য মাসিক পাঁচ টাকা ভাড়ায় বারাণসীতে একটি বাড়ি নিয়ে সমিতির কাজ শুরু হল। সেবাব্রতের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ এই সমিতি এবং তার পরিচালকদের সংবাদ যথাসময়ে স্বামীজীর কানে পৌঁছাল। উৎফুল্ল স্বামীজী বললেন : "কাশীর ছেলেরা আমার spirit-এ কিছু কাজ করেছে" ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসটা স্বামীজী বারাণসীতে ছিলেন। সেসময় চারুচন্দ্র এবং তাঁর বন্ধুরা স্বামীজীর সাক্ষাৎ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পান এবং তাতে তাঁদের উৎসাহ উদ্দীপনা প্রবলতর হয়।

স্বচক্ষে তাঁদের কাজ দেখে স্বামীজী তাঁদের বললেন : "দয়া নয়, সেবা-ই তোমাদের জীবনের নীতি হোক। দেবমূর্তিজ্ঞানে জীবসেবা দ্বারা কর্মকে ধর্মে পরিণত কর।... তোমরা Poor Men's Relief কি করবে? False colours-এ march করো না। তোমাদের সমিতির নাম কর Home of Service-সেবাশ্রম।" সেবাব্রতীরা সঙ্গে সঙ্গে সমিতির নাম পরিবর্তন করে দিলেন 'Ramakrishna Home of Service'-'রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম'। স্বামীজী স্বয়ং নিজের নামে সেবাশ্রমের সাহায্যার্থে জনসাধারণের কাছে ইংরেজীতে একটি আবেদন (Appeal) প্রস্তুত করে দিলেন এবং ভগবান শিবের প্রসিদ্ধ ক্ষেত্রে জীবরূপী শিবকে পূজা নিবেদন করতে জনসাধারণকে তিনি আহ্বান জানালেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সেবাব্রতের ইতিহাসে স্বামীজীর এই 'আবেদন' বস্তুতপক্ষে একটি মহাসনদ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। স্বামীজীর তিরোধানের অল্পকালের মধ্যে (নভেম্বর ১৯০২) সেবাশ্রম রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। দরিদ্র-সহায়সম্বলহীন আর্ত ও পীড়িতের সেবার যে ঐতিহ্য সেবাশ্রমের তৎকালীন পরিচালকবর্গ নির্মাণ করেছিলেন তা সুপ্রাচীন শিবক্ষেত্রের মানুষের কাছে একটি নতুন আদর্শকে উন্মোচিত করেছিল। 'সেবাশ্রম' আজ মহীরূহে পরিণত, কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, চারুচন্দ্র (পরবর্তী কালে স্বামী শুভানন্দ) এবং কেদারনাথ (পরবর্তী

কালে স্বামী অচলানন্দ) প্রমুখের অনলস আত্মবিলয়ী কর্মকাণ্ডই এই মহীরূহের মূলে। নবযুগের গায়ত্রীমন্ত্র 'ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু...' তাঁরা শুধু নিজেরা কানে শুনেই ক্ষান্ত ছিলেন না, নিজেদের প্রাণের প্রতিটি তন্ত্রীতে দেহের প্রতি রক্তকণিকায় তাকে আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন।

মহুলা-সারগাছি, কনখল, বারাণসীতে অনুশীলিত বিবেকানন্দের ব্যবহারিক বেদান্তের প্রবক্তাগণকে-'বিরাটের সুমহান উপাসনা-মন্দিরের' উপাসকগণকে স্বচক্ষে দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা জ্ঞানতপস্বী মহেন্দ্রনাথ দত্তের। তাঁর একটি মর্মস্পর্শী মন্তব্য দিয়ে আমাদের আলোচনার উপসংহার টানছি :

''কথিত আছে, পুরাকালে দধীচি মুনি নিজের অস্থি দিয়া দেবতাদিগের হিতসাধন করিয়াছিলেন-রামকৃষ্ণ মিশনের এই সকল কর্মীরাও ইস্টকের পরিবর্তে নিজেদের অস্থি-কঙ্কাল দিয়া, চুন-সুরকীর পরিবর্তে মজ্জা দিয়া এবং জলের পরিবর্তে হৃদয় ও গাত্রের তপ্ত শোণিত দিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের (তথা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত বিরাটের উপাসনা-মন্দিরের) হর্ম্য নির্মাণ কয়িয়াছিলেন। যদি নিরপেক্ষ হইয়া সমালোচনা করা যায়, তাহা হইলে স্বামীজী-প্রণোদিত এইসকল কর্মিগণ পুরাকালের দধীচি মুনি হইতে কোন অংশেই ন্যূন হইবেন না।''